স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে বর্তমান সময়ে প্রতিটি দম্পতির মাঝেই কমবেশি সচেতনতা গড়ে উঠছে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

> *সিয়ামের সময়ে রাতের বেলা (সহবাসের উদ্দেশ্যে) তোমাদের স্ত্রীদের কাছে যাওয়াকে হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের আবরণ এবং তোমরা তাদের আবরণ।*[১]

বিয়ে এমন একটি সম্পর্ক যেখানে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই দেহের পোশাকের মতো একে অন্যকে আবৃত করে রাখে। তারা পরস্পরকে নিরাপত্তা দেয়, আবরুকে রক্ষা করে চলে এবং শারীরিক উষ্ণতায় আনন্দিত হয়। এই অধিকার অন্য কাউকেই দেওয়া যায় না। বৈবাহিক সম্পর্কের এই তিনটি বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো সম্পর্কের মাঝে পাওয়া যায় না।

অনেকেই এখন এই বিষয়টি অনুধাবন করা শুরু করেছে, কাছের মানুষগুলোই আমাদের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে খুশি এনে দিতে পারে। ঠিক একইভাবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বেশি দুঃখকষ্টের কারণও তারাই। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭

একে অপরের চেয়ে বেশি আপন আর কেউ নেই। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য কুরআনের বাণী অপেক্ষা সুন্দর আর কী হতে পারে!

> *তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আরো একটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে দয়া ও ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। নিঃসন্দেহে এতে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তাভাবনা করে।*[১]

একটি দম্পতির সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত পারস্পরিক যোগাযোগ, প্রশান্তি, আস্থা ও সমবেদনা। এগুলো দুর্বল হয়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে, বৈবাহিক সম্পর্কটি বিবর্ণ হয়ে যায়। খুব দ্রুত সম্পর্কটি একটি বোঝা ও পুঞ্জীভূত দুশ্চিন্তায় পরিণত হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবাহিত জীবনে যোগাযোগের অভাবের কারণে প্রাথমিকভাবে বৈবাহিক দুশ্চিন্তার সূত্রপাত হয়। ধীরে ধীরে তা দূরত্বে এবং সবশেষে তালাকে পৌঁছায়।

অনেক স্বামী-স্ত্রী তাদের দাম্পত্যজীবনকে একটি কারাগার কিংবা নরক মনে করেন। যদিও তারা তাদের সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে এই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন না, আবার ঝগড়াঝাঁটি থেকেও নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না। যখন পরিস্থিতি এত খারাপ দিকে গড়িয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে, বিয়েটি তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে। এটি কেবল বাহ্যিক কিছু কারণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তবে গবেষণায় একটি ভালো বিষয় উঠে এসেছে। আর তা হলো, যারা এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছেন সেই সকল স্বামী-স্ত্রী খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পারেন, পারস্পরিক কথোপকথন ও বোঝাপড়াই একটি সম্পর্কের মূলভিত্তি। আর এটাই তাদের মধ্যকার যেকোনো সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

দেখা যায়, মূল সমস্যার সূত্রপাত তখনই ঘটে যখন স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের স্বভাব, চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারেন না, যা তাদের কথোপকথনকে ব্যর্থ করে তোলে। আর এই ব্যর্থতা ধীরে ধীরে কথা বলার চেষ্টাকেই আশঙ্কাজনক হারে

---

[১] সুরা রুম, আয়াত : ২১

কমিয়ে দেয়। একবার কথোপকথনের মাঝে ঝগড়াবিবাদ বা সমস্যা শুরু হলে তা উভয়ের মস্তিষ্কেই দাগ কেটে যায়। আর তারা পরবর্তী সময়ে কথা বলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। একাকী থাকতেই তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, অধিক আনন্দদায়ক বলে মনে করে।

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, আগের অধ্যায়গুলোতে পরিবারের মানুষগুলোর মধ্যকার আলাপচারিতা নিয়ে এত বিস্তারিত আলোচনার পর এখন দম্পতির মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলাদাভাবে কেন আলোচনা করা হচ্ছে? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা কেবল দম্পতির মধ্যেই আলোচনা করে নিতে হবে। হতে পারে পারিবারিক বৈঠকে সেটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। আবার দুজনের মাঝে কথোপকথনে যেটা সমস্যা বলে মনে হয়, পরিবারের সবার সাথে কথোপকথনে সেটা সমস্যা বলে মনে না-ও হতে পারে।

পারিবারিক কথোপকথনে প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন ও আদবকায়দা নিয়ে অনেক কথা ইতোমধ্যেই বলা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি দম্পতিদের মাঝে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ আলাপচারিতার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করতে চাই। এতে করে তারা পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে আনন্দে মোড়ানো সুখী-সুন্দর একটি জীবন যাপন করতে পারবে। একইসাথে শিশু লালনপালনের দায়িত্বগুলোও সুন্দরভাবে ভাগাভাগি করে নিতে পারবে।

আলাপচারিতা কেবল মুখনিঃসৃত কোনো কথা নয়। বরং এর পেছনে একটি মহৎ লক্ষ্য থাকে। আগেই বলেছি, দুই বা ততোধিক মানুষের মাঝে মতপার্থক্য থাকে বলেই তো কেবল আমরা একে আলাপচারিতা বলছি। নয়তো সেরেফ সাধারণ কথাবার্তা কিংবা গল্পগুজব বলা হতো। তবে একটি দম্পতির মধ্যকার সম্পর্কের ধরন, তাদের আত্মিক পার্থক্য এবং যেকোনো বিষয়ে তাদের বোঝাপড়া—এ সবকিছু সম্মিলিতভাবে একটি আলাপচারিতাকে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর এজন্য সবসময় মতপার্থক্য থাকাটা জরুরি নয়।

একটি গবেষণায় দেখা যায়, একজন নারী প্রতিদিন গড়ে ১৩ হাজার শব্দ বলে থাকেন। যেখানে একজন পুরুষ বলেন মাত্র ৮ হাজার শব্দ। এই তথ্য আমাদের এটাই ইঙ্গিত করে যে, মেয়েরা প্রাকৃতিকভাবেই বেশ বাক্‌পটু। পুরুষেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘরের বাইরে কাজ করে। এ কারণে নারীরা আশা করেন, পুরুষেরা কথাবার্তায় তাদের থেকে অনেক বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, জ্ঞানী ও সমৃদ্ধ মানুষ। একইসাথে

পুরুষরা তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা কিংবা গল্পগুজব করলে নারীরা নিজেদেরকে অনেক বেশি নিরাপদ বলে মনে করে। এজন্যই হয়তো দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন, 'কথা বলো, যেন আমি তোমায় দেখতে পাই।'

কথোপকথনের মধ্য দিয়ে একটি মেয়ে তার স্বামীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। তিনি তার কাজ বা জীবিকা উপার্জন নিয়ে কোনো গুরুতর সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছেন কি না, মেয়েটি সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা পোষণ করছেন কি না, সেটাও জানা যায়।

এসব কারণে কথা বলা ও কোনো বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করাকে প্রতিটি মেয়ে পুরুষের দায়িত্ব বলে মনে করে। অধিকাংশ মেয়ের অভিযোগ থাকে, তাদের স্বামী বেশিরভাগ সময় চুপচাপ থাকেন এবং কথাবার্তায় খুব একটা চটপটে নন। এমনকি কোনো বিষয় সঠিক নাকি ভুল সেটাও তারা বুঝতে পারেন না। আমরা আশা করি, পুরুষেরা তাদের স্ত্রীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা যেভাবে করে থাকেন, ঠিক সেভাবেই তারা বৈবাহিক সম্পর্কের বোঝাপড়ার দায়িত্বটিও বহন করবেন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কেবল সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে দেখেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বোঝাপড়া ভালো, এটা ভেবে নেওয়া কোনো পুরুষের জন্যই উচিত নয়। এমন ধারণা পোষণের জন্যই তারা কথা বলার কিছু খুঁজে পান না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ব্যস্ততা কিংবা সময়ের স্বল্পতার অজুহাতে খুব দ্রুত কথা শেষ করেন। কখনো আবার একই কথা বারবার বলতে থাকেন—এসবের কোনোটিকেই কথোপকথন বলা চলে না।

দম্পতির মধ্যকার কথোপকথন একটি সুখী বৈবাহিক সম্পর্কের সেতুবন্ধন। এটা কেবল দাম্পত্যজীবনের সমস্যা সমাধানেরই মাধ্যম নয়, বরং সমস্যা প্রতিরোধ করার মাধ্যম।

এটা পরিষ্কার যে, মেয়েরা তাদের বিবাহিত জীবনের থমথমে ভাবকে অপছন্দ করে। তারা চায়, তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক কাজকর্মে, মানুষের সাথে যোগাযোগ, আলাপচারিতা ও দেওয়া-নেওয়ায় পরিপূর্ণ থাকবে। আর তারা যদি তাদের সম্পর্কে এই আকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলোর কোনো একটি অনুপস্থিত পায়, তবে যেকোনো ধরনের ঘটনার অবতারণা করতে প্রস্তুত থাকে, যেন আবার তাদের সম্পর্কের মাঝে সজীবতা ফিরে আসে।

একজন নারীর কাছে কথোপকথন হচ্ছে আবেগপূর্ণ কোনো ছোঁয়া যা সে সবসময় তার স্বামীর কাছ থেকেই প্রত্যাশা করে থাকে। নারীদের পরম আকাঙ্ক্ষা—স্বামীর সাথে কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা, একসাথে আনন্দঘন সময় কাটানো, একে অন্যের কাছে অভিযোগ করা এবং যেকোনো সমস্যায় শলাপরামর্শের মধ্য দিয়ে সমাধান খুঁজে নেওয়া।

নবিজির জীবনীজুড়ে স্ত্রীদের সাথে কথাবার্তা, আন্তরিকতা এবং একে অন্যের সাথে সময় কাটানোর দৃষ্টান্ত দিয়ে পরিপূর্ণ। নবিজির সাথে তার স্ত্রীদের আলাপ-আলোচনার বেশকিছু উদাহরণ হাদিসে এসেছে। এর মধ্যে একটি ঘটনা আম্মাজান আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন।

একবার ১১ জন নারী একসাথে গল্পগুজব করছিলেন। গল্পের বিষয়বস্তু—কার স্বামী কেমন মানুষ? প্রত্যেকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিজ নিজ স্বামীর আচরণের বর্ণনা দিতে লাগল। তাদের মধ্যে উম্মু যারআ তার স্বামী সম্পর্কে এত সুন্দর কিছু উপমা দিলেন যে, সবাই বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বাড়ি ফিরে এই ঘটনাটি নবিজিকে শোনালেন। নবিজি তখন বললেন, 'আবু যারআ তার স্ত্রীর কাছে যেমন, আমিও তোমার কাছে তেমন?'[১] ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ *সহিহ বুখারি*তে 'পরিবারের সাথে উত্তম ব্যবহার' অধ্যায়ে এই হাদিসটি এনেছেন।

'নারীদের আত্মসম্মান ও আবেগ' অধ্যায়ে তিনি আরো একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন—আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার তাকে বলেছিলেন, 'তুমি কখন আমার ওপর রেগে থাকো আর কখন খুশি থাকো, সেটা আমি বুঝতে পারি।'

'আপনি কীভাবে বুঝতে পারেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ?'

'যখন তুমি আমার ব্যাপারে খুশি থাকো তখন বলো, মুহাম্মাদের রবের কসম। আর যখন কিছুটা রেগে থাকো তখন বলো, ইবরাহিমের রবের কসম।'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন। রাগের সময় আপনার নামটা এড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে।' [২]

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৫১৮৯; *সহিহ মুসলিম* : ২৪৪৮; *সুনানুন নাসায়ি* : ৯০৮৯; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৭১০৪

[২] *সহিহ বুখারি* : ৬০৭৪; *সহিহ মুসলিম* : ২৪৩৯

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বয়সের পার্থক্য ছিল প্রায় ৪০ বছর। আর তিনি আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। তাই আমাদের উচিত তার আন্তরিকতা, আবেগ, স্নেহ-ভালোবাসা, মমতা ও নম্রতার শিক্ষাগুলো ভালোভাবে অনুসরণ করা। কারণ নিশ্চয় তিনিই পৃথিবীর বুকে আসা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ৫৯% স্বামী বিশ্বাস করেন, যেসব বিষয়ে তাদের উপদেশ প্রয়োজন, সেসব বিষয়ে তাদের স্ত্রীরা বেশি জ্ঞান রাখেন। এদিকে ৮৪% নারী নিজ স্বামীদের ক্ষেত্রে এই একই ধারণা পোষণ করেন। আবার কর্মক্ষেত্রের ৭৬% নারী বলেছেন, তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বামীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে উপকৃত হয়েছেন। অথচ মাত্র ৪৭% পুরুষ তাদের স্ত্রীদের সাথে কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে থাকেন।

এর অর্থ হলো, আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারীরা অধিক বিশ্বাসী। এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলেও, বাস্তবে নারীরা পুরুষদের তুলনায় কথোপকথনে অতটা আগ্রহী নয় এবং প্রায়ই তা এড়িয়ে চলতে চায়। মেয়েদের উচিত এই অসংগতির কারণ খুঁজে বের করা এবং সে অনুযায়ী এর সমাধান করা।

একটি কথোপকথন কখন সার্থক হয়ে ওঠে?

আশ্চর্য হলেও সত্যি, দাম্পত্যজীবনে স্বাভাবিক কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা ও অবসরে টুকিটাকি গল্প করার জন্য আলাদা আলাদা সময় বের করাটা বেশ কঠিন। বিষয়টা হলো, তারা একে অন্যের ঘনিষ্ঠতা, সাহচর্য, প্রশান্তি, নিরাপত্তা ও মমতার কেন্দ্রবিন্দু। এ কারণে নিজেদের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করতে যাওয়াটা তাদের কাছে কঠিন ও অপছন্দের। অতএব আমরা বলতে পারি, স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনকে সার্থক করে তুলতে হলে তাদের অবসরকে কাজে লাগিয়ে একসাথে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। আর এজন্য দুটি মৌলিক জিনিস থাকা চাই—

এক. তারা যে বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে চাচ্ছেন সেটা যত তুচ্ছই হোক না কেন, তার প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করা।

দুই. কথোপকথনকে এমনভাবে গুছিয়ে নিতে হবে যেন তা অখণ্ড ও সমাধানকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে।

আলাপচারিতার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমি মনে করি, তাদের মধ্যকার যেকোনো সম্পর্কের লক্ষ্যই তাদের সংযোগকে ধরে রাখে। এই সম্পর্ক দুটি মস্তিষ্কের, দুটি আত্মার, দুটি হৃদয়ের, দুটি ভিন্ন পদমর্যাদার, দুটি চাহিদার, সার্বিকভাবে জীবন সম্পর্কে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির এবং একইসাথে পরিবারটির ভবিষ্যতের।

দম্পতির মধ্যকার সুন্দর সম্পর্ক একটি সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে। তারা ধীরে ধীরে একে অন্যের পছন্দ-অপছন্দকে আরো ভালোভাবে বুঝতে শেখে, যা পরবর্তীকালে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ একটি সাজানো-গোছানো পরিবার গঠনে সাহায্য করে।

এরকম পরিস্থিতিতে, অনেক সমস্যা স্বাভাবিকভাবেই মিলিয়ে যায়। ছোটখাটো সমস্যাগুলোর সহজেই সমাধান বের করা যায়। আর বড় বড় সমস্যাগুলোর সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়। কিছু কিছু পরিবার আলাপ-আলোচনাকে গুরুত্বহীন মনে করে। তাদের জন্য এগুলো কেবলই পরিবারের কোনো সদস্যের অস্বাভাবিক আচরণ, কারো বিরুদ্ধে নালিশ-অভিযোগ এবং অপমান নিয়ে কথা বলার উপলক্ষ্য মাত্র। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, তারা মাত্রাতিরিক্ত কথা বলার জন্য আফসোসও করে থাকে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক মজবুত রাখার দায়ভার প্রাথমিকভাবে একজন স্বামীর ওপরই বর্তায়। স্ত্রীও চান তার স্বামী যেন তাকে ভালোভাবে বোঝেন, তার আবেগ-অনুভূতিকে গুরুত্ব দেন। স্ত্রীরা ভুল হোক আর শুদ্ধ হোক, তাদের পরম আকাঙ্ক্ষা, তাদের চাওয়া-পাওয়াগুলো যেন তাদের স্বামীরাই পূরণ করেন।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে কিছু কার্যকরী কৌশল—

এক. দুজনের জন্য সুবিধাজনক সময়টিকে কথা বলার জন্য নির্বাচন করতে হবে। এমন যেন না হয়, একজন ব্যস্ত তো আরেকজন অবসর সময় কাটাচ্ছে। স্বামী স্ত্রীকে বলছে, 'তোমার সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আছে। তুমি দয়া করে তোমার হাতের কাজগুলো রাখো।' অথবা স্ত্রী বলছে, 'আমি এখন তোমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছি। আমার মনে হয়, কথাগুলো তোমার বইপড়া থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

এভাবে জোর করে ডেকে এনে কথা বলাটা অনুচিত। কারণ, এতে করে দুজনেই বাধ্য হয়ে কথা বলতে আসেন। তারা আশা করতে থাকেন, হুট করে শুরু হওয়া আলাপটি হুট করেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের জীবনসাথিকে এভাবে বলি, 'কতদিন তোমার সাথে কফি খাওয়া হয় না! আমরা কি আজ একসাথে কফি খেতে পারি? এক ঘণ্টা পর কি ফ্রি থাকবে তুমি? তোমার সাথে কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।'

ভুলে গেলে চলবে না, প্রতিটি সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার শ্রেষ্ঠ নিয়ম হলো, সবসময় অপর মানুষটিকে বুঝিয়ে রাজি করা। তাকে বাধ্য করে বৈঠকে বসানো কখনোই ভালো সিদ্ধান্ত হতে পারে না। বাধ্য করে কথা বলার চেয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়ায় অনুষ্ঠিত আলাপচারিতা বেশ ভালো ফল বয়ে আনে।

দুই. যখন কোনো দম্পতি কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে বসে কিংবা কোনো সমস্যার সমাধান করতে চায়, তখন যেন তারা পর্যাপ্ত সময় নিয়ে কথা বলতে পারে, এটা লক্ষ রাখতে হবে। এমন যেন না হয়, যে আলোচনার জন্য এক ঘণ্টা প্রয়োজন তার জন্য আধ ঘণ্টা হাতে নিয়ে কথা বলা শুরু করলেন। সময়ের স্বল্পতা কথার মাঝে বারবার বিঘ্ন ঘটাতে পারে। এরকম তড়িঘড়ি আলোচনা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে ধাবিত করতে পারে। যা হয়তো পরবর্তীকালে পরস্পরের মধ্যকার দূরত্ব আরো বাড়িয়ে দেবে। অতএব আলাপ-আলোচনার জন্য উভয়ের পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় এবং মাথা ঠান্ডা থাকা প্রয়োজন।

তিন. সত্যি বলতে কী, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক বেশ জটিল। এটা গভীর ও ঘনিষ্ঠ, স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজ। আবার একইসাথে এটা ঠুনকো, জটিল, অগভীর এবং সংবেদনশীল। সম্পর্কের সফলতা নির্ভর করে অপ্রত্যাশিত ঘটনা সামাল দিতে পারার দক্ষতার ওপর। ঠিক এ কারণেই বিশেষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। সাধারণত এর জন্য খুব বুদ্ধিমান, চতুর বা জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের চেয়ে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির বেশি প্রয়োজন।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পৃথিবীর যেকোনো দুজন ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্কের তুলনায় বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত। তবু নিজেদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ার চর্চা থাকাটা বাঞ্ছনীয়। যেমন ধরুন, একজন স্ত্রী চান না, তার স্বামী শ্বশুর-শাশুড়ির মনোমালিন্য নিয়ে কথা বলুক। একজন স্বামী হয়তো

খাবার টেবিলে বসে ঘরোয়া আলাপ করতে পছন্দ করেন না। একজন স্ত্রী হয়তো কিছু কিছু খাবার খুবই অপছন্দ করেন। এই বিশেষত্বগুলোকে আমাদের সম্মান করা উচিত এবং এসবের সাথেই মানিয়ে চলা উচিত।

কথোপকথন একটি মানবিক সম্পর্ক যার মাধ্যমে একজন আরেকজনকে প্রভাবিত করে। এ কারণেই আশা করা যায়, কথোপকথন শুরুর আগে একজনের যে দৃষ্টিভঙ্গি বা অবস্থান ছিল, একটি সফল কথোপকথনের শেষে তার পরিবর্তন হবে। তবে একে কোনো ধরনের পরাজয় বা ব্যর্থতা বলে মনে করা যাবে না। ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন, 'আমাদের মতামতগুলো সঠিক। তবে তাতে ভুল থাকার আশঙ্কাও রয়েছে। আবার আমাদের বিপরীত মতামতটি ভুল যা কিনা ঠিক হলেও হতে পারে।' তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি যদি কারো সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ে থাকি, তবে তা এই জন্য যে, আমার কিংবা আমার প্রতিপক্ষের মুখ থেকে আল্লাহ সত্যকে স্পষ্ট করে দেবেন।'[১]

কেউ তর্কে জিতে গেলে তার উচিত হবে কিছু সান্ত্বনাসূচক কথা বলে প্রতিপক্ষের কষ্টকে কিছুটা লাঘব করে দেওয়া। যেমন : 'এই কথাগুলো আমার চিন্তাতেও একবার এসেছিল।' অথবা 'আমিও একবার এটাই ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে আমি আমার ভুলটা ধরতে পেরেছি।' ভুলে গেলে চলবে না, যেকোনো পরিস্থিতিতে আমাদের প্রধান লক্ষ্য থাকবে সম্পর্কটিকে যত্ন করে আগলে রাখা।

চার. যে ধরনের কথাবার্তায় স্বামী/স্ত্রী অপমানিত, বিব্রত বা অবহেলিত বোধ করে সেগুলো এড়িয়ে চলা সম্পর্ককে আগলে রাখার একটি অংশ।

কখনো আপনার স্ত্রীকে বলবেন না, 'আমি যদি তোমার জীবনে না আসতাম, তা হলে তোমাকে আইবুড়ো হয়ে বাপের বাড়িতে বসে থাকতে হতো।' অথবা আপনার স্বামীকে এমনটা বলবেন না, 'আমার বাবা-মা তোমার প্রতি দয়া দেখিয়ে তোমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল। নয়তো আমাকে স্ত্রী হিসেবে পেলে হাজারটা মানুষ নিজেকে ধন্য মনে করত।'

কোনো স্বামীর উচিত নয় তার স্ত্রীকে এটা বলা, 'তোমার ছেলে তো বড় হয়ে তোমার ভাইয়ের মতো মাস্তান হবে।' কোনো নারীর উচিত নয় তার স্বামীকে

---

[১] *তাহযিবুল ফুজালা*, পৃষ্ঠা : ২৮; *আল ফাতাওয়া*, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ৩৪৪

বলা, 'তোমার মেয়েও তোমার বোনদের মতোই। পড়াশোনায় একেবারে গোল্লা!' এই কথাগুলো দাম্পত্যজীবনের মধুর সম্পর্কটিকে ধ্বংস করে দেয়। যে আন্তরিকতা থাকা উচিত ছিল তার কেবল একটি ছায়া পড়ে থাকে। ভালো-খারাপ প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছে। কেউ দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। খারাপটা বেশি দেখলে ফলাফল খারাপই আসে।

যেসব পরিস্থিতিতে শক্তভাবে 'না' বলে দেওয়াটা খুব জরুরি—

এক. যখন কোনো আলাপচারিতা নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায়ের সুযোগে পরিণত হয়ে যায়। অনেক মানুষ রয়েছেন যারা ভাবেন, তার স্বামী/স্ত্রী যখন কোনো আলাপে বসার কথা বলবেন তখন সকল চাওয়া-পাওয়া, যেমন : টাকার প্রয়োজন বা পরিবারের কোনো দোষী ব্যক্তির পক্ষে সাফাই গাওয়া কিংবা অন্য কোনো অনুরোধ তার কাছে করা যেতে পারে। অবশ্যই মাঝে মাঝে এর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তা যেন অভ্যাসে পরিণত হয়ে না যায়।

দুই. যেকোনো ধরনের হুমকি অথবা ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইলকে অবশ্যই 'না' বলুন। যেমন—

'তুমি যদি আমার সাথে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা না করো, তাহলে কিন্তু আমি বাপের বাড়ি চলে যাব।'

'আমি যাওয়ার পর কী হয়েছিল সেটা যদি তুমি আমাকে না বলো, তাহলে আর কখনো আমার কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করতে পারবে না তুমি।'

এসব কথা আক্ষরিক অর্থেই খুব আপত্তিকর। কারণ তা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কটিকে মজবুত করার পরিবর্তে আরো দুর্বল করে দেয়।

তিন. আলোচনা চলাকালীন ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা কিংবা বিরক্তিভাব প্রকাশ করা যাবে না। এতে করে অপর মানুষটির কাছে মনে হবে, আলোচনাটি বোধহয় ফলপ্রসূ হচ্ছে না। তাই এটা আর বেশিদূর এগোবে না।

চার. এমন কোনো হতাশাব্যঞ্জক কথা বলা যাবে না যা অন্যের সাধ-স্বপ্ন আর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে এক নিমিষেই ধ্বংস করে দেয়। একজন স্বামী বললেন, 'আমি স্বপ্ন দেখি, আমার সন্তানরা একদিন অনেক বড় হবে। ওদের অনেক নাম-যশ-খ্যাতি

আসবে।' স্ত্রী তখন বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন, 'বাস্তববাদী হও। আকাশকুসুম চিন্তা করা বন্ধ করো। তোমার ছেলে তো পড়াশোনাই করে না। টেনেটুনে কোনোরকম ম্যাট্রিক পাস করেছে ও। আর তোমার মেয়ের কথা তো বাদই দিলাম। দুইবার ইন্টার ফেল! অথচ কী হাস্যকর স্বপ্ন দেখো তুমি!' এমন বিরূপ মন্তব্য কখনো কারো কাছ থেকে কাম্য নয়। এটা একেবারেই অনুচিত। এ ধরনের কথা স্বামীর মনে প্রচণ্ড আঘাত হানবে। কিন্তু স্ত্রী যদি কথাগুলো এভাবে বলত, 'মাশা আল্লাহ, খুব সুন্দর স্বপ্ন তোমার! কিন্তু এই স্বপ্নপূরণের জন্য আমাদের অনেক মেহনত করতে হবে। সবার আগে ওদেরকে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে। স্বপ্নের সাথে যদি মেহনত না থাকে, তবে তা আকাশকুসুম কল্পনা। এখন চলো কীভাবে আমরা আমাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারি তা নিয়ে একটু আলোচনা করি।'

পাঁচ. আবার কোনো একজনের কথা শেষ হওয়ার আগেই পরাজিত মনোভাব পোষণ করে রাখাও ঠিক নয়। 'পারিবারিক প্রশান্তি' বজায় রাখার নামে অনেকে 'পারিবারিক বৈঠক' থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখেন। অথবা অপরজনকে শান্ত করা লক্ষ্যে তার সমস্ত রাগারাগি সহ্য করে যান। কিছু মানুষ আলাপচারিতায় নিজেকে অপমানিত বা পরাজিত মনে করার সাথে সাথে সেখান থেকে আচমকা উঠে যান। আর ঘোষণাও দিয়ে দেন, আলোচনায় যে সিদ্ধান্ত আসবে তা তিনি মেনে নিতে রাজি। কারণ তিনি কাউকে কষ্ট দিতে চান না। অথচ তিনি বুঝতেই পারলেন না যে, তার এই কাজটি পরিস্থিতিকে আরো বেশি তিক্ত করে দিলো।

নারী-পুরুষের মতের মিল, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য নিয়ে নানা ধরনের মতবাদ প্রচলিত থাকতে পারে। তবে বাস্তবতা হলো, নারী এবং পুরুষের শারীরিক, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক গঠনে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। এগুলো স্বাভাবিকভাবেই তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যে, আশা-আকাঙ্ক্ষায় এমনকি জ্ঞান-অভিজ্ঞতায় ব্যাপক পার্থক্য এনে দেয়। যখন তারা একটি পরিবার হয়ে বাস করতে শুরু করে তখন এই পছন্দ-অপছন্দ, চাওয়া-পাওয়া, মতামত, চাহিদা এবং ধরনের ভিন্নতাগুলোই তাদের মধ্যকার ঝগড়াবিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রত্যেক স্বামী/স্ত্রীর উচিত নিজ নিজ সঙ্গীর এই ভিন্নতাগুলোকে নিরীক্ষণ করতে থাকা, যতদিন না উভয়ের মধ্যকার বোঝাপড়ায় সামঞ্জস্য আসে। এমনকি একজন যদি অপরের মতের সাথে পুরোপুরি একমত না-ও হতে পারে, তবু তাদের মধ্যকার দয়া-মায়া, আত্মসংযম, নম্রতা, সদাচরণ এবং বোঝাপড়াকে বিবেচনায়

রাখতে হবে। এসব তাদের মতভিন্নতাকে মানিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার এই মতভিন্নতা দাম্পত্যজীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আর এমনটা প্রায়ই ঘটে থাকে। আবার এই ভিন্নতাকেই একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে মনে করলে তা অনায়াসেই পারিবারিক জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। এক্ষেত্রে ভিন্নতাকে আমাদের সহায়ক মনে করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

ভিন্নতার কিছু উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে—

এক. স্পষ্টতই, স্বামীর সাথে একজন নারীর কথা বলা যতটা জরুরি তার তুলনায় একজন পুরুষের জন্য তার স্ত্রীর সাথে কথা বলাটা বেশি জরুরি। যেমন ধরুন, একজন স্ত্রী তার স্বামীর সাথে কোনো বিষয়ে কথা বলার জন্য ফোন করলেন। জরুরি কথার পাশাপাশি তিনি এটাও চাইবেন, তার স্বামী যেন তাকে ভালোবাসাময় আবেগপূর্ণ কিছু কথা বলে, যার জন্য স্বভাবজাতভাবেই প্রতিটি নারী অপেক্ষায় থাকেন। একজন পুরুষ বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকেন, 'এই কথার মানে কী?', 'এটা করতে কত সময় লাগবে?' এবং 'এর ফলাফল কী হবে?' স্বামী এমনভাবে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করেন যেন কোম্পানির কোনো প্রতিনিধি দুটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি করার আগে খোঁজখবর নিচ্ছেন। আর ততক্ষণে স্ত্রী বেচারি কথা বলার আগ্রহই হারিয়ে ফেলে।

আবার সমস্যায় জর্জরিত একজন নারী শক্ত যুক্তি কিংবা অনন্য কোনো সমাধান—কোনোটারই ধার ধারেন না। তিনি কথোপকথনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বা এর ফলাফল নিয়েও মাথা ঘামান না। আর অধিকাংশ দম্পতির কথোপকথন ব্যর্থ হওয়ার পেছনে এটাও একটা কারণ।

সমস্যা সমাধানের প্রথম ধাপ হলো, সমস্যাকে ভালোভাবে বুঝতে পারা। দম্পতির মধ্যে একে অন্যের মতামতকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। আর এভাবেই তাদেরকে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

যেমন ধরুন, এক নারী তার স্বামীকে বলছেন, 'আমি আধঘণ্টার জন্য তোমার সাথে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমাদের ছেলে প্রায়ই বাইরে বাইরে থাকে। আমার মনে হয়, আমি এই ব্যাপারে তোমাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারব, যেগুলো হয়তো কাজে আসবে।' আর এদিকে তার স্বামী ধরেই নিলেন, এই